গণপতিকে কেউ কখনও আটকাতে পারেনি

হাতি ছিল প্রাচীন আরণ্যক এবং নবীন নাগরিক পরিসরের মধ্যে একটি প্রধান যোগসূত্র। এই অমিতশক্তিধর প্রাণীটিকে তুচ্ছ করার কোনও উপায় ছিল না। আজও নেই। বাঙালির সমাজেও গণেশ পুজো হইহই করে বাড়ছে।

জহর সরকার

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, ০০:০৩:৫৮

বিঘ্নরাজ। গণেশ চতুর্থী। মুম্বই, ২০১৫

এ দেশে হিন্দু ক্যালেন্ডারের ভাদ্রপদ মাসে শুক্লা চতুর্থী গণেশ বা বিনায়ক চতুর্থী হিসেবে পালন করা হয়। কলকাতার মানুষ গণেশ চতুর্থীকে তুচ্ছ করলে ভুল করবেন। সর্বভারতীয় পরিসরে এটিই দুর্গাপুজোর একমাত্র যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বী। তা ছাড়া, এই উত্সব

দুর্গাপুজোর চেয়ে অনেক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। দুর্গাপুজো প্রধানত বাঙালির উত্সব, বাংলার বাইরে বা বিদেশেও তা-ই। কিন্তু গণেশ চতুর্থীর প্রচলন কেবল মহারাষ্ট্রে নয়, গোটা দাক্ষিণাত্য জুড়ে। অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, কর্নাটক এবং গোয়ায় এই উত্সব পালিত হয়, এ ছাড়া তামিলনাড়ুতে এর নাম পিলায়ার, কেরলে লম্বুধারা পিরানালু। ইতিহাসে দেখি, শিবাজি খুব বড় আকারে গণেশ উত্সব করতেন। পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরেও গণেশ পূজার নানা উল্লেখ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট লিখিত প্রমাণ আছে যে, ১৮৯২ সালে পুণে শহরে গণেশ বা বিনায়ক চতুর্থী প্রথম সমবেত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং সর্বজনীন উত্সব হিসেবেও এটি দুর্গাপুজোর চেয়ে ২৬ বছর বেশি পুরনো। তার পর, ১৮৯৪ সাল থেকে লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক মহারাষ্ট্র জুড়ে গণেশ উত্সবের প্রসার ঘটান, এবং কলকাতার বারোয়ারি পুজোর মতোই এই উত্সবের জাতীয়তাবাদী চরিত্রটি ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের বিভিন্ন ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকের লেখা থেকে নানা ভারতীয় উত্সবের বিবরণ সংকলন করেছিলেন জন মারডক। তিনি লিখেছেন, ‘গণেশ শিব ও পার্বতীর, অথবা পার্বতীর একার সন্তান হিসেবে বিনায়ক, গণপতি, পিলায়ার ইত্যাদি অন্য নানা নামেও পরিচিত। প্রত্যেকটি হিন্দু গৃহে তিনি পূজিত হন এবং প্রত্যেক স্কুলের ছাত্র ‘গণেশায় নমঃ’ বলে পাঠ শুরু করে, প্রতিটি ভারতীয় পুস্তক এই মন্ত্র দিয়ে শুরু হয়। ব্যবসা আরম্ভের আগে প্রত্যেক ব্যবসায়ী তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। বিবাহ ও অন্য নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সব দেবতার আগে গণেশের বন্দনা করা হয়। উনিশ শতকেই এইচ এইচ

উইলসনও লিখেছিলেন, 'কাজে সফল না হলে হিন্দুরা ভাবেন, সেই ব্যর্থতার কারণ তাঁর নিজের অক্ষমতা নয়, দানবীয় অশুভ শক্তির বাধাই তার জন্য দায়ী। গণেশ দানবদের অধিপতি, তাই কার্যসিদ্ধির জন্য হিন্দুরা তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।' মজার ব্যাপার হল, গণেশ ছিলেন 'গণ'দের ঈশ্বর। গণরা কিন্তু দানব নয়, তারা ছিল তথাকথিত 'অপবিত্র' এবং অনার্য মানুষ, যথা, ভূত, নাগ, যক্ষ, পিশাচ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, রক্ষগণ, সিদ্ধ, প্রমথী ইত্যাদি। সংস্কৃত আর্য সমাজ প্রথমে এদের সম্পর্কে ভয়ানক কুৎসা প্রচার করত। কিন্তু ক্রমশ এই অল্পসংখ্যক মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডি ছাড়িয়ে ভারতীয় সমাজ যত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপস্থিতি স্বীকার করতে বাধ্য হল এবং কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের দক্ষতা যত স্বীকৃতি পেল, নিম্নবর্ণের প্রতি এই বিরাগের ঝাঁঝ তত কমে যেতে থাকল।

সুতরাং গণেশ হলেন বহু ধরনের মানুষের সম্মিলনে উঠে আসা নতুন ভারতের প্রতীক। এবং তাঁর বিঘ্নেশ্বর বা বিঘ্নরাজ নামটি জানিয়ে দেয়, 'সমস্ত বাধাবিপত্তির ঈশ্বর' থেকে এই দেবতার ধারণাটি কী ভাবে 'বিঘ্ননাশক'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। শিবপুরাণে এবং মহাভারতের শান্তিপর্বে তাঁর উল্লেখ আছে, এবং গণ-ঈশ বা গণ-পতি নামটি বজায় থেকেছে, ফলে তাঁর উৎপত্তির কথা আমরা বিস্মৃত হইনি। লক্ষণীয়, বিভিন্ন জনসমাজে পূজিত নানা প্রাণী-দেবতা কালক্রমে আর্য দেবতাদের বাহনে পরিণত হয়, কিন্তু অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে: হনুমান, নাগদেবী এবং গণেশ— তাঁরা নিজেরাই দেবতার স্বীকৃতি পান। পার্বতীর তরুণ পুত্র যুদ্ধে তার মাথাটি হারানোর পরে কী ভাবে তার দেহে হাতির মাথা জুড়ে দেওয়া

হল, তা নিয়ে অনেক কাহিনি প্রচলিত, কিন্তু মোদ্দা কথাটা এই যে, ভারতের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীটি এক তরুণ দেবতার কাঁধে চেপে দেবালয়ে প্রবেশ করেছিল। এ ভাবেই একটি প্রাক্-হিন্দু ধর্মীয় প্রথা হিন্দু আচারে স্থান পেল। ভারতীয় সভ্যতার নিরন্তর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বসতি বা 'ক্ষেত্র' যখন ক্রমাগত 'বন-অঞ্চল'কে গ্রাস করতে থাকল, তখন হাতি ছিল প্রাচীন আরণ্যক এবং নবীন নাগরিক পরিসরের মধ্যে একটি প্রধান যোগসূত্র, যুদ্ধে ও শান্তিতে তার সমান উপযোগিতা। এই প্রাণীটি ছিল রাজকীয় এবং দৈব ঐশ্বর্যের প্রতীক, দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত কিংবা মায়ার স্বপ্নে হাতির দর্শন এবং বুদ্ধের আবির্ভাবের কাহিনিতে তার স্বাক্ষর আছে। এই অমিতশক্তিধর প্রাণীটিকে তুচ্ছ করার কোনও উপায় ছিল না।

ঠিক একশো বছর আগে চার্লস এইচ বাক গণপতির সমবেত আরাধনা সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'বহু অলঙ্কারে সজ্জিত এই মূষিকবাহন দেবতার মূর্তির বোধনের পরে তাকে কয়েক দিন একটি আরাধনাগৃহে স্থাপন করা হয়, তার পরে শোভাযাত্রা সহকারে বিদায়মন্ত্র এবং শুভেচ্ছাবার্তা উচ্চারণ করতে করতে নদী, জলাশয় বা সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হয়। মনে হয়, যেন একেবারে আজকের কথাই পড়ছি, তাই না? তফাত অবশ্য আছে। গণেশ এখন রকমারি শৈলী, আকৃতি এবং অঙ্গভঙ্গি নিয়ে আসেন। কলকাতায় এখনও ভাঙা কাচ কিংবা সুপুরি দিয়ে গণেশমূর্তি তৈরির পাগলামি শুরু হয়নি বটে, কিন্তু মনে হয় সে দিন খুব দূরে নয়।

কলকাতার মতোই অন্য নানা শহরেও চাঁদা তুলে প্যান্ডাল বানিয়ে গণেশ পুজো শুরু হয়েছে। আবার অনেক বাড়িতেও গণেশ পুজো

হচ্ছে। সপরিবার দুর্গার চেয়ে গণেশের মূর্তি বসানো অনেক সহজ। তবে ‘গণপতি বাপ্পা মোরিয়া’র জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে মুম্বইয়ের চলচ্চিত্র শিল্প একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন সিনেমায় বর্ণাঢ্য গণপতি উত্সবের দৃশ্য এই দেবতাকে দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে, কমবয়সি বাঙালিরাও এই উত্সবের আড়ম্বরে এবং নাচগানে যোগ দিচ্ছে। জমকালো সুরে ও বাদ্য সহযোগে গণেশ সম্পর্কে বলিউডের গান এখন খুবই জনপ্রিয়। তবে এখনও উত্কৃষ্টতম যে ‘আরতি’গুলি গীত হয় মহারাষ্ট্রে, এবং তিন শতাব্দী আগে সেগুলি সৃষ্টি করেছিলেন সন্তকবি সমতা রামদাস।

গণেশের শুঁড়টি বাঁ দিকে হেলে থাকা উচিত না ডান দিকে, কিংবা কী করে তাঁর একটি দাঁত ভাঙল, সে সব বিষয়ে নানান ব্যাখ্যা ও কাহিনি আছে। তবে সে দিকে না গিয়ে আমরা বরং একটু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে চোখ ফেরাই। তাইল্যান্ডে গণপতি আজও ফ্রা ফিখানেত বা ফ্রা ফিক্কানেসুয়ান নামে পূজিত হন, নাম দুটি এসেছে বর বিঘ্নেশ ও বর বিঘ্নেশ্বর থেকে। পালি মহা বিনায়ক থেকে মায়ানমারে তাঁর নাম হয়েছে মহা পেইন্নে। শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধরা বলেন গণ দেবীয়ো, হিন্দুরা ডাকেন ঐয়নায়ক দেবীয়। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, জাপানে তিনি পূজিত হন শোতেন নামে। বিনয় বহ্‌ল লিখছেন, টোকিয়োর প্রাচীনতম গণেশ মন্দির হল মাত্‌সুচিয়ামা শোতেন, এটি অন্তত হাজার বছরের পুরনো। গণেশ কী ভাবে জাপানের তান্ত্রিক আচারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছেন, সেটা ভাবলে অবাক হতে হয়। এবং, জাপানিরা আজও তাঁর আরাধনায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন: ওঁ ক্রী গিয়াকু উন সোয়াকা!

গণেশের ছেলেমানুষি নিয়ে একটা কথা বলে শেষ করি। কার্ত্তিকের সঙ্গে তাঁর রেষারেষির সেই গল্প তো আমরা সবাই জানি। ‘ত্রিভুবন’ ঘুরে আসার দায়িত্ব পেয়ে বেচারি কার্ত্তিক ব্যস্তসমস্ত হয়ে ময়ূর-বাহনে চড়ে মহাকাশ অভিযানে গেলেন, আর গণেশ টুক করে নিজের মা-বাবাকে প্রদক্ষিণ করে বললেন, তাঁরাই তো ত্রিভুবন! এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে শৈবায়ত ও বৈষ্ণবায়ত ধারা দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল রীতিমত প্রবল। তা থেকে নানান বিরোধ বাধত। কৃষ্ণের ‘বালগোপাল’ রূপটি বিপুল ভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। শৈবায়তদের ভাণ্ডারে কোনও শিশুদেবতা ছিল না। গণেশ এই শূন্যস্থান পূরণ করলেন। নেয়াপাতি ভুঁড়িটির কারণে তাঁর আদর আরও বেশি হল। প্রাচ্যদেশের মানুষ কোনও দিনই ভুঁড়ি নিয়ে লজ্জিত বোধ করেনি, বরং তাকে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক বলে গণ্য করেছে, চিন ও জাপানে ‘লাফিং বুদ্ধ’-এর মূর্তিগুলি সেটাই জানিয়ে দেয়। ‘গণ’দের এই অধিপতি কত বিচিত্র ভূমিকা পালন করে আসছেন, সেটা আমাদের এখন বোঝা দরকার।